পরশ পাথর : 'পরশ পাথর' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্বের একটি বিখ্যাত কবিতাগুলির একটি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ শান্তিনিকেতনে বসে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় 'সাধনা' পত্রিকায় এটি মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে 'সোনার তরী' কাব্য প্রকাশের সময় এটি এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়—এরপর 'সঞ্চয়িতা'য়।

বিষয় বিশ্লেষণ : সারা শরীর ধূলা মলিন, মাথায় বৃহৎ জটার ভার—শরীর অত্যন্ত কৃশকায় এক ব্যক্তি উন্মাদের মত পথে পথে পরশ পাথর খুঁজে বেড়ায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার ওষ্ঠে অধরকে চেপে রাখায় অভিব্যক্ত। সবসময় সতর্ক দৃষ্টি মেলে সে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়। তার আপনার জন বলে সংসারে কেউ নেই। কেউ তাকে ডেকে কথাও বলে না। পথের ভিখারীর চেয়েও সে আরো দীনহীন। অথচ তার কামনার জিনিসটি অনুসন্ধান রত এই ব্যক্তির অভিমান এত প্রবল যে সে সোনা রূপাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, এমন কি রাজসম্পদকেও সে বড় বলে মনে করে না—কেননা সে পেতে চায় সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয় যা—সেই পরশ পাথর।

পরশ পাথর সন্ধানরত মানুষটির চোখের সামনে সমুদ্র অসীম রহস্য নিয়ে উপস্থিত হল। সমুদ্রও পাগলের এই পাগলামি দেখে হেসে কুটিকুটি। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে দিনরাত্রির নানা পরিবর্তন নতুন রহস্যের ছোঁয়া যেন ব্যক্তিটিকে স্পর্শ করতে চায়। প্রকৃতি বার বার ইঙ্গিতে যেন জানায়—যা মানুষের কাম্যধন তা কোথায় লুক্কায়িত রয়েছে। অথচ নিজের ঝোঁকে জীবনের প্রতি বিমুখ এই অনুসন্ধিৎসু তা গ্রহণ করতে পারে না।

সমুদ্র অতীত ইতিহাসের ভাণ্ডার। বহুপূর্বে সৃষ্টির আদিতে সুর-অসুর এসে দাঁড়িয়েছিল এর তীরে। এর অতল রহস্যে অনুভবের চেষ্টা করে বহু দিন কাটিয়েছিল তারা। তারপর এক সময় সমুদ্র মন্থন করে পাতাল থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছিল তারা। লক্ষ্মী জীবনে স্বচ্ছলতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। অথচ সেই সৌন্দর্যের আকর সমুদ্রের তীরে খ্যাপা তাকে না খুঁজে আপন মনে সে কেবল পরশ পাথর খুঁজে বেড়ায় শীর্ণ দেহে, জীর্ণ বস্ত্রে।

প্রথম প্রথম পরশ পাথর পাবার আশায় বিশেষ যত্ন নিয়ে অন্বেষণ করত সেই সন্ন্যাসী। তারপর আস্তে আস্তে তার প্রয়াস থেকে সচেতনতা গেছে ঘুচে। আশা দীপ কখন নিভে গেছে কিন্তু রয়ে গেছে খোঁজার অভ্যেস। সমুদ্র তীরে তরুর শাখায় বসে বিরহী বিহঙ্গ কাকে যেন ডাকে—কিন্তু তাকে সে পায় না। সন্ন্যাসীর কানে এ সব ডাক যায় না। সমুদ্র যেমন সারাদিন রাত ঊর্ধ্বে হাত তুলে অবিরাম কাকে পেতে চায় অথচ কাউকে পায় না। কিন্তু ফিরতেও পারে না সে ওই ওর একমাত্র ব্রত। সমুদ্রের মত অসীম আকাশ তলে দীর্ঘ জটাধারী ব্যক্তির একমাত্র কামনা পরশ পাথর অন্বেষণ।

একদিন এক গ্রামবাসী ছেলে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল—তার কোমরে সোনার শিকল এল কোথা থেকে? সন্ন্যাসী চমকে ওঠে। তাকিয়ে দেখে তার কোমরে সোনার শিকল বটে। চোখ কচলে বার বার দেখে তার সন্দেহ ভঙ্গ হয়। প্রবল অনুশোচনায় সে নিজের কপালে আঘাত করতে থাকে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য। নিজের অসচেতনতার জন্য নিজের উপর নির্দয় অত্যাচার করতে চায় সে। পরশ পাথর খোঁজার প্রয়াস যখন অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল তখন সে কেবল নুড়ি কুড়িয়ে কোমরে শেকলে 'ঠন্' করে

ছুঁইয়ে দূরে ফেলে দিত—শেকলের দিকে চেয়েও দেখত না আর—এই ভাবেই কখন তার হাতে এসে পড়েছিল পরশ পাথর অথচ অসাবধানতাবশত সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সে।

জীবন শেষ হয়ে এল। দিনেরও শেষ। সন্ন্যাসী আবার নূতন করে পুরানো পথে পরশ পাথর খোঁজা শুরু করে। কিন্তু সেই শক্তিও নেই, নেই সেই উৎসাহও। পেয়ে হারানোর দুঃখে হৃদয় ভেঙে গিয়েছে একেবারে। যে পথ দিয়ে একদিন সে চলে গিয়েছিল সম্মুখে সে পথ বহু দীর্ঘ—সে পথ পেছনে মৃতের মত পড়ে আছে। অর্ধেক জীবন ধরে খুঁজে খুঁজে যাকে পাওয়া গেছল এক পলের অন্যমনস্কতায় তাকে খুইয়ে বসেছে সে—বাকি অর্ধেক জীবনে, ভগ্ন প্রাণে সেই পরশ পাথরের অন্বেষণেই তাই চলল সে আবার।

রূপক কবিতা : 'বাক্যম্ রসাত্মকম্ কাব্যম্' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যের সংজ্ঞা অনুসারে বক্তব্যের যথাযথ চিত্রণ কাব্য নয়—বক্তব্যকে রসাত্মক করে শিল্প সম্মত উপায়ে তার প্রকাশ ঘটানো দরকার। শিল্প সম্মত উপায়ে কাব্য বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য আছে শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ প্রয়োগ, অলঙ্কার প্রয়োগ নিপুণতার বিষয়টি। তত্ত্ব বিষয়টি কাব্যে তথ্যরূপে নয় সত্যরূপে পরিবেশিত হওয়াই কাম্য। সে সত্য বাস্তব সংসারের নয়—কাব্যের সত্য। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'আরো সত্য'। এ আরো সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার জন্য যুগে যুগে কবিগণ এক এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন এমনই এক পদ্ধতিতে রূপকের প্রয়োগ কবিতাকে করে তোলে মায়াময়।

রূপকের মধ্যে একই সঙ্গে দুটি সত্যের স্বরূপ উদঘাটিত হয়। একটি আপাত সত্য অন্যটি অন্তর্নিহিত সত্য। এই দুই সত্য সমধারায় প্রবহমান। বাইরের কাহিনী রূপকের আপাত সত্যকে প্রকাশ করে। আর কাহিনীর আভ্যন্তরীণ অর্থ অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রকাশ করে থাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় চর্যাকার থেকে শুরু করে রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী, মুকুন্দরামের কাল থেকে অদ্যকাল পর্যন্ত কবিবৃন্দ প্রয়োজন অনুসারে কবিতায় রূপকের ব্যবহার করেছেন। কবিতায় যখন রূপক স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান তাকে বলে রূপক কবিতা।

কবির মনের চিন্তাকে সরাসরি কাব্যে প্রকাশ করলে সব সময় তা স্বস্তিদায়ক হয় না। তাই কবিগণ সাহায্য নিয়ে থাকেন রূপকের। পূর্বেই বলেছি রূপকের ভেতর স্পষ্টতই দুটো আখ্যান পাওয়া যায় অর্থাৎ একটা স্পষ্ট আখ্যানভাগ অন্যটা অন্তর্গত আখ্যান ভাগ। কিন্তু এই দুই আখ্যানের সঙ্গে সরাসরি কোন সংযোগ বা সম্বন্ধ নেই—এরা পরস্পর একেবারেই বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেক চরিত্র বা ঘটনা এবং স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির স্পষ্ট আখ্যানভাগের দিক দিয়ে যে সার্থকতা, বৈশিষ্ট্য বা উপযোগিতা আছে তার সঙ্গে রূপকের আখ্যানভাগের কোন মিল বা সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ একেবারেই সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন—এর আবার নিজস্ব সার্থকতা, বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ 'The Pilgrims progress' বইটির কথা বলা যায়। এই বইয়ের শব্দার্থে আছে কোন এক ব্যক্তি পৃথিবীর দুঃসহ দুর্গম পথে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। নানা বাধা-বিঘ্ন-সংকুল সেই ভ্রমণের কাহিনী গ্রন্থটির স্পষ্ট আখ্যান ভাগের বিষয় বস্তু।

কিন্তু রূপকের ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় এর বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক। পার্থিব জগৎ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে যাত্রার পথে নানা বাধাবিঘ্ন, বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়—এই তার কাহিনী। তাই দেখা যায় ব্যাঙ্গার্থ ও সাধারণ অর্থের মধ্যে কোন স্পষ্ট ভেদাভেদ নেই—সমান্তরাল রেখায় নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দুটি কাহিনীর ধারা অব্যাহত।

'পরশ পাথর' কবিতাটিকেও রূপক কবিতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। কারণ এ কবিতার মধ্যেও দুটি কাহিনী সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 'পরশ পাথর' কবিতায় পরশ পাথর সন্ধানে রত ব্যক্তিটিকে নানা সময়ে নানা অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে।

প্রথম স্তবকে— 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।'
দ্বিতীয় স্তবকে— 'সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।'
'খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।'
তৃতীয় স্তবকে 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।'
চতুর্থ স্তবক খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।'

পর পর চারটি স্তবকে 'খ্যাপা' বা পাগল বলে সম্বোধিত হয়েছে ব্যক্তিটি। 'খ্যাপা' বা 'পাগল' রূপে সমাজে চিরকাল সেই সমস্ত মানুষ চিহ্নিত হয়ে থাকেন যাঁরা নিত্য নূতন অন্বেষণে রত থাকেন—গবেষণা কার্যে রত থাকেন। যার ফলে স্বাভাবিক জীবনধারার দ্বন্দ্বের সঙ্গে তাদের জীবনের মিল হয় না। কিন্তু এর পর আর 'খ্যাপা' সম্বোধন করা হল না,—

পঞ্চম স্তবক 'একদা শুধালো তারে গ্রামবাসী ছেলে'
'সন্ন্যাসী ঠাকুর, একী! কাঁকালে ও কী ও দেখি...'
অতঃপর 'সন্ন্যাসী চমকি ওঠে,.....'
ষষ্ঠ স্তবকে ঃ 'সন্ন্যাসী আবার ধীরে,.....'

সুতরাং পরের দুটি স্তবকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে 'সন্ন্যাসী' রূপে অভিহিত করা হল।

তাই দেখা যায় 'পরশ পাথর' কবিতায় স্পষ্টতর দুটি কাহিনী রয়েছে। একটি স্পষ্ট আখ্যান ভাগ—তার কাহিনী নিম্নরূপ—

এক ব্যক্তি উদ্ভ্রান্তের মত পরশ পাথর খুঁজে বেড়ায়। পরশ পাথরের স্পর্শে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করাই তার উদ্দেশ্য। পরশ পাথরকে চেনার জন্য সে তার কোমরে বেঁধে নিয়েছে লোহার এক শেকল। কেন না পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়। পাথর কুড়িয়ে সে সেই শেকলে স্পর্শ করিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। এমনি করে সে দিন কাটায়। বাস্তব জীবন, সুন্দর প্রকৃতির মোহময়ী আকর্ষণ তার কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। পরশ পাথর খোঁজার প্রয়াসটাই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়,—

"এত দিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ!
খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু, বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।"

তার সেই অভ্যস্ত চলার একদিনে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করে—'সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?' সে চমকে উঠে একথা জেনে যে পরশ পাথরের খোঁজে সে

পথে নেমেছে বহুকাল তারই ছোঁয়ায় তার অন্যমনস্কতায় তার লোহার শিকল সোনার শিকল হয়ে গেছে।

অন্যভাবেও কবিতাটির দুটি অর্থ মেলে। প্রথমটি এরূপ—একজন গবেষক পরশ পাথর অর্থাৎ তাঁর গবেষণার সিদ্ধিলাভের আশায় গবেষণা করে চলেছেন। গবেষণার পথ দুরূহ। এর জন্য তিনি ছেড়েছেন সংসারের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। খ্যাপার মত অনিয়মিত জীবন যাপন করেছেন তিনি। অতঃপর একদিন যখন তাঁর সিদ্ধির সময় সন্নিকটে এল সে সময় তাঁর সামান্য অসাবধানতায় তা নষ্ট হয়ে গেল। ভগ্ন মনোরথ হয়েও গবেষক আবার বাকি জীবন ধরে সেই হারিয়ে ফেলা সিদ্ধির সন্ধান করতে লাগলেন।

দ্বিতীয়টির ভিত্তি আধ্যাত্মিক। 'সন্ন্যাসী' শব্দটি সে দিকেই ইঙ্গিত করে। একজন সন্ন্যাসী পরশ পাথর অর্থাৎ ভগবৎ অন্বেষণে রত। নিত্য গভীর সাধনা করতে করতে ভগবৎ প্রাপ্তির আশা যখন সুদুর পরাহত বলে মনে তাঁর হল—তখনও তিনি ঈশ্বরের আরাধনার পথ থেকে দূরে সরে আসতে পারেন না। অভ্যাসবশত সন্ন্যাসী সাধনা করে চলেন। হঠাৎ তিনি একদিন উপলব্ধি করেন ঈশ্বর তাঁর কাছে এসেছিলেন-কিন্তু তাঁকে তিনি ঠিক ভাবে বুঝে উঠতে না পারার জন্য তাঁকে হারিয়েছেন। ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে সন্ন্যাসী পুনরায় ছলনাময় ঈশ্বরকে পাবার সাধনা শুরু করেন। রূপকের এই আবরণ থাকায় কবিতাটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সার্থক হয়েছে।